



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 793 - 800

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সাঁওতালদের প্রধান কৃষি উৎসবসমূহ : একটি নির্বাচিত পাঠ

ড. সুমিতা চক্রবর্তী

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

সম্মু নাথ কলেজ

Email ID: sumita.brp1990@gmail.com

 0009-0006-0795-5493

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

কৃষি উৎসব,
বলিদান, বোঙ্গা,
সোহরাই, রাড়
অঞ্চল, জনজাতি,
লোকাচার, পরব,
নায়েক, চাষাবাদ,
ধান।

Abstract

Agrarian culture or Farm lore is the life culture of agrarian people which has evolved over time into a proper tradition. It can also be called farm culture. Farm culture is all about research, exploration of nature and practice of knowledge to keep the pace of life on the soil. Not only agriculture-fisheries, sericulture, lac cultivation, bee keeping, duck, chicken, goat, cow and other livestock processing and preservation of the produce are all part of agricultural culture. Due to the dynamic flow of food production and preservation, various cultures festivals, fairs, beliefs, reforms, rituals, prohibitions are developed around. Again, the agriculturist expresses the human consciousness that there is happiness in creation. While planting paddy they make talk, chat different tuning phrases and they sing while harvest comes home leisure is enjoyed in folk dances. These also lie within the boundaries of agricultural culture.

Most of the people in the adjoining districts of south West Bengal are agriculturists. Agricultural traditions or agricultural culture can be observed in the life of the Santals people of South-West Bengal which is to be discussed in the research study through various agricultural culture and festivals.

The awakening of human civilization began with agricultural work. It is said that agriculture is the root of creation. This is because agriculture is closely intertwined with creation and culture of South-West Bengal. The harvest rites in vogue in both Rarh region and the whole of South-West Bengal are also deserving of our attention. The offering of sacrifices to the corn spirits understood to have been the protectors of agriculture and crop production was intended to pacify those spirits – a fact which seldom passed unnoticed by the people of Bengal. Moreover, previously the people of Bengal were not unaware of the prevalence of sacrifice even human sacrifice in the world for the productivity of the soil and vegetation. The tradition still holds sway. Ere long, some cases of human sacrifice in existence among the aborigines in Bengal like rain charms arrested the attention of Hunter. At present, animal sacrifices

to those corn spirits much too common in rural Bengal are aimed at gaining bumper crops. In fact, the magical powers of blood are being deeply rooted into primitive mind since time out of mind. With the progress of civilisation, human sacrifices of the past have given way to animal sacrifices like those of buffaloes, goats, pigs, chickens etc. This is a general phenomenon.

Discussion

মানব সভ্যতার জাগরণ হয়েছে মূলত কৃষিকার্যের মাধ্যমেই। বলা হয়, সৃষ্টির মূলেই রয়েছে কৃষিকাজ। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে কৃষিকাজ নিবিড়ভাবে জড়িত। কৃষিকাজের সঙ্গে বেশ কিছু আচার-অনুষ্ঠান যুক্ত রয়েছে, যেগুলি কৃষি উৎপাদনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। কৃষি ও ফসল উৎপাদনের রক্ষাকর্তা হিসেবে বিবেচিত হতেন যেসকল শস্য দেবতারা, সেইসব দেবতাদের শান্ত করার প্রয়াসে তাঁদের উদ্দেশ্যে নানারূপ বলিদান করা হত — এই বিষয়টি কখনই বাংলার মানুষের দৃষ্টি এড়ায়নি। এছাড়াও, জনজাতি সমাজে জনজাতিদের কৃষি উৎপাদনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই বেশ কিছু অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এই ঐতিহ্য আজও বিদ্যমান। একসময় বাংলার আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত নরবলির কিছু ঘটনা, হাণ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রামের নামে বলিদান, বর্তমানে গ্রামীণ বাংলায় শস্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে পশুবলি অত্যন্ত সাধারণ একটি ঘটনা এবং এর উদ্দেশ্য হল প্রচুর ফসল লাভ করা। রক্তের জাদুকরী ক্ষমতা আদিম মানুষের মনে সুপ্রাচীনকাল থেকে গভীরভাবে প্রোথিত। ডি. ডি. কোসাম্বি বলিদানের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করেছেন—

“সুশৃঙ্খল কৃষিকাজ ও পশুপালনের একরকমের আদিম মায়াবী পূর্বসূরী” হিসেবে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অতীতের নরবলি এখন মহিষ, ছাগল, শূকর, মুরগি ইত্যাদির মতো পশুবলিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে এটি একটি সাধারণ ঘটনা।”^১

সাঁওতালদের প্রধান উৎসব সমূহ—

মাঘ-সিম : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সাঁওতালরা প্রথমবারের মতো উপরোক্ত উৎসবটি উদযাপনের মাধ্যমে সূচনা করেছিল নতুন বছরের। এই উৎসবটি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের পূর্ববর্তী বছরকে বিদায় জানানোর প্রতীক। নতুন বছরের শুরুতে চাষাবাদের অনুপস্থিতির কারণে এই জনজাতিকে পোষা কুকুরসহ দলবদ্ধভাবে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু সংগ্রহ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলতে গেলে— বন্য মধু, ফল, প্রাথমিক পর্যায়ের তসর এবং ঘর তৈরির জন্য শাল পাতা, সুতো তৈরির জন্য তাল পাতা, আঠা বা আঠা জাতীয় পদার্থ, ঘর ছাওয়ার জন্য তাল গাছের ডাল এবং বাবুই ঘাস (দড়ি তৈরির জন্য ইত্যাদি) প্রভৃতি সংগ্রহ করতে হয়। জাহের নামক স্থানে রাস্তার সংযোগস্থলে একটি পবিত্র বেদি বা থান স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে দেব-দেবীদের পূজা করার রীতির প্রচলন ঘটে। সেই সময় থেকে শুরু করে সাঁওতালরা এই থানে পূজা নিবেদনের প্রথাটি আজও কঠোরভাবে মেনে থাকে।^২ অনেক ক্ষেত্রে, পাহাড়ের চূড়াগুলোই এই উৎসব আয়োজনের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাঁওতালরা এই বিভিন্ন মেলাকে ‘বুরু’ বলে অভিহিত করে। ফেব্রুয়ারি মাসের মেলাগুলো তাদের কাছে ‘মাঘবুরু’ নামে পরিচিত। এই সময়টি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সময়ে নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।^৩

পাতা পরব : সাঁওতালদের পাতা উৎসব বাঙালিদের চড়ক পূজার মতোই শুরু হয় চৈত্র মাসে (মার্চ-এপ্রিল নাগাদ), বাহা উৎসব শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরই। এই উৎসবে প্রমোদপ্রিয় সাঁওতালরা বাঙালিদের মতোই বাঁশ দিয়ে চড়ক তৈরি করে ঘোরায়ে। অনেক এলাকায় এই উৎসব উপলক্ষে সাঁওতালরা ভক্তদের মতোই চাল ও অন্যান্য জিনিস সংগ্রহের জন্য বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে। এই সময় তারা মহাদেবের পূজা করে থাকে। সবশেষে, তাদের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় অনুষ্ঠান।

মা-মারহ : বৈশাখ মাসকে নতুন বছরের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই সময়টি বাঙালিদের আনন্দের কাল। এই মাসে সাঁওতালদের কোনো বড় উৎসব না থাকায়, তারা বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখীর সময়ে নৃত্য-গীতের উৎসবে অংশগ্রহণ করে ও ‘মা-মারহ’ দেবীর পূজা দেয়। আনুমানিক ১ থেকে ৪ দিনব্যাপী চলে এই উৎসব। সমগ্র দেশে জনজাতি সমাজের সবচেয়ে বড় উৎসব হিসেবে পরিচিত মা-মারহ উৎসবটি কুঠামডাগারি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব আয়োজনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল মহামারী, প্লেগ এবং রোগব্যাধি প্রতিরোধ করা।^৪

‘লো বীর সেদ্দা’ বা শিকার উৎসব : পুরুলিয়ার সাঁওতালদের আরেকটি বার্ষিক উৎসব বৈশাখ মাসের বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে অনুষ্ঠিত হয়, যা ‘লো বীর সেদ্দা’ বা শিকার উৎসব নামে পরিচিত। এই উৎসব চলাকালীন সাঁওতালরা জঙ্গলে শিকারে মগ্ন থাকে। এটি জঙ্গলের সঙ্গে তাদের একাত্মতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই উৎসবে গ্রামের প্রধানেরা মিলে ‘মাকিরা’ জঙ্গলে একত্রিত হন এবং গুরুতর ধর্মীয় ও সামাজিক অপরাধ বা সামাজিক অনাচারের শাস্তিদানের মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন। স্থানীয় সূত্র অনুসারে, বিষ্ণুপুরের বাসুদেবপুরে একটি বিশাল এলাকা জুড়ে ঘন শালবন রয়েছে, যেখানে প্রতি বছর বৈশাখের ৫ তারিখে স্থানীয় লোকেরা শিকারে যায়। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ছাড়াও ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন প্রান্তের আদিবাসীরা এই শিকার উৎসবে অংশ নেয়। এই দিনে বাসুদেবপুর চাতালে শিকার উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে। অন্দের বাসিন্দা হোপন মান্ডির মতে, এই উৎসবে পশু শিকারের চেয়ে আনন্দই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথা অনুযায়ী, শিকারের পর শিকারীর রাতে জঙ্গলেই থাকার কথা, কিন্তু বর্তমানে এই ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন রূপ নেয়। শিকারের পর জঙ্গলের দেবীর কাছে শিকার করা মৃত পশুদের পূজা দেওয়া হয়।^৫

এরোক-সিম (বীজ বপনের জন্য উৎসর্গ) : এরোক-সিম হল বীজ বপনের উৎসব, যা আষাঢ় মাসে (জুন মাসের মাঝামাঝি) অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য উৎসবের মতো নয়, যেখানে গ্রামের পক্ষ থেকে নৈবেদ্য নিবেদনে শুধুমাত্র নায়েকের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। এরোক-সিম, সোহরাই এবং বাহা উৎসবগুলোয় গ্রামের তরফ থেকে সমষ্টিগত ভাবে প্রকাশ্যে এবং ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব উদ্যোগে- উভয় প্রকার বলিদানেরই প্রচলন রয়েছে।

সীমান্তবর্তী রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতালদের এই জনজাতিভিত্তিক ফসল কাটার লোকাচারটি আষাঢ় মাসে (মে-জুন) ধানের জমিতে বীজ ছিটানোর মাধ্যমে পালিত হয়। একজন সাঁওতাল জমিতে বীজ বপন করে আনন্দিত হয়। ফলশ্রুতিতে তারা দেবতাদের ভোগ হিসেবে মোরগ ও ছাগল উৎসর্গ করতে তথা একটি গোষ্ঠীভোজের আয়োজন করতে উৎসাহিত হয়। এর সঙ্গে ‘অম্বুবাচী’-র কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়; তাছাড়াও এটিকে সাঁওতাল এবং রাঢ়ের অন্যান্য জনজাতিদের দ্বারা পালিত বছরের প্রথম লাঙ্গল দেওয়ার উৎসব হিসেবেও মনে করা হয়। এরোক-সিম, জনজাতির প্রথম কৃষি উৎসব, জুন মাসে ধানের বীজ বপনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

এটি শুরু হয় যখন প্রতিটি গৃহকর্তা নায়েকের কাছে মোরগ সরবরাহ করতে সম্মত হন, যাতে নায়েক সেগুলো জাহের থানে উৎসর্গ করতে পারেন। এরপর মারাং বুরু, জাহের এরা, মোরেকো, তুরনিকো, পরগনা, গৌসাই এরা এবং মাঝি হারাম-এর সম্মানে প্রত্যেকের জন্য একটি করে মোরগ উৎসর্গ করা হয়। সব আচারের মধ্যে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, একটি কালো মোরগ সীমান্ত দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়, আর বাকিগুলো সীমান্তের সংলগ্ন অঞ্চলের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের কাছে বলি দেওয়া হয়।

জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে বর্ষার শুরুতে যখন ভুট্টা, ইরি, গুন্ডি এবং ধানের বীজ বপনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো চাষাবাদের জন্য জমি প্রস্তুত করা চলতে থাকে, তখন সাঁওতালরা তাদের দয়ালু বোঙ্গার কাছে বিনীতভাবে সাহায্য প্রার্থনা করে। গ্রামের সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে গ্রামের পুরোহিত জাহের থানে দয়ালু বোঙ্গার কাছে মোরগ উৎসর্গ করেন এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেন যাতে বোঙ্গা দয়াপরবশ হয়ে এই পবিত্র মাটিকে উর্বর করেন এবং প্রচুর ফসল নিশ্চিত করেন। এই ক্ষেত্রে পুরোহিতের বারবার করা সনির্বন্ধ প্রার্থনাটি নিচে দেওয়া হল—

“হে সৃষ্টিকর্তা বাপু ঠাকুর, জাহের-এরা, মারান বুরু এবং অন্যান্য দেবগণ, আমরা আপনাদের প্রণাম জানাই। বীজ বপন উৎসবের নামে আমরা আপনাদের কাছে বলিদান উৎসর্গ করছি, যাতে আমরা এক

অংশে বীজ বপন করলে বারো অংশে প্রচুর ফসল ফলে। বাতাস যেন বৃষ্টি নিয়ে আসে। প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিত হোক ভূমিতে। গ্রামে যেন মাথাব্যথা এবং পেটের পীড়ার মতো কোনো রোগ না আসে। সোনার শিকলে বাঁধা সোনার জলবাহী পাত্রে করে এই রোগগুলোকে আমাদের জনজাতিদের থেকে দূরে অন্য কোথাও নিয়ে যান। আমাদের গবাদি পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাক। তারা যখন জঙ্গলে যায়, তখন বন্য প্রাণীদের আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষা করুন আপনি। আমাদের শিকারী কুকুরদের বাঁচিয়ে রাখুন।”^৬

হরিয়্যার-সিম (চারা গজানোর জন্য উৎসর্গিত) : সাঁওতালদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিভিত্তিক আচার হল হরিয়্যার-সিম, যা শ্রাবণ মাসে (জুলাই-আগস্ট) ধানের চারা রোপণের পর অনুষ্ঠিত হয়; বর্ষাঋতুর বৃষ্টির একটি স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা মেনেই সংঘটিত হয়। এই আচার পালনের উদ্দেশ্য হল ধানের সবুজায়ন নিশ্চিত করা। এই আচারের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো পর্যালোচনায় লিখিত হল—

- ক) নায়ক কর্তৃক সমগ্র গ্রাম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে গ্রামের দেবতাকে মুরগি উৎসর্গ করা।^৭
খ) ধান, ভুট্টা, ইরি ও গুন্দলির অঙ্কুরোদগম ও বৃদ্ধির জন্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা এবং
গ) জাহের থানে দয়ালু বোঙ্গাদের কাছে বিনীতভাবে চারাগাছের সুস্থত্বের জন্য প্রার্থনা করা।
যখন দেবতাদের ধন্যবাদ জানানো হয়, তখন জনজাতির বিশ্বাস অনুসারে ধানের রং সবুজ দেখায়। এই ঘটনা ভালো ফসলের ইঙ্গিতবাহী।^৮
ছাতা পরব বা ইরি, গুন্দলি নওয়াই (প্রথম ফল উৎসর্গ)

এই উৎসবটি সাঁওতাল জনজাতীর দেবতাদের কাছে বাজরা, ইরি, গুন্দলি এবং ভুট্টার প্রথম ফল উৎসর্গ করার সঙ্গে সম্পর্কিত। ইরি এবং গুন্দলি (বাজরা) আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পাকে এবং এটি তাদের চাষের প্রথম ফসল যেটি কাটা হয়। যখন বাজরা ফসল তোলায় উপযুক্ত হয়, তখন গ্রামের পুরোহিত নায়ক বাজরার কিছু শিষ্য সংগ্রহ করেন এবং গ্রামের সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে জাহের থানে দয়ালু বোঙ্গাদের সামনে সেগুলো রাখেন। তারপর দুধ উৎসর্গ করে এই প্রার্থনা করেন—

“হে সৃষ্টিকর্তা বাপু ঠাকুর এবং জাহের এরা, আমরা আপনাদের প্রণাম জানাই, আমরা আপনাদেরকে শস্যের প্রথম ফল উৎসর্গ করছি। আমরা এগুলো খাব, কিন্তু আমাদের যেন পেটের পীড়া বা মাথাব্যথা না হয়।”

এর পরপরই গ্রামবাসীরা তাদের ফসল ঘরে তোলে। প্রথম ফল উৎসর্গের অনুরূপ ঘটনা ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং প্রাচীন মেসোপটেমীয় জগতেও লক্ষ্য করা যায়। এই সূত্রধরে সাঁওতালরা বৈশ্বিক ধর্মগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। তারা উদার বোঙ্গাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রতীক হিসেবে প্রাপ্ত অনুগ্রহের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের প্রথম ফল উৎসর্গ করে থাকে। গ্রামে ফিরে পুরোহিত গ্রামপ্রধানের বাড়ির মন্দিরে যান এবং একই ধরনের প্রার্থনা করে নতুন শস্য উৎসর্গ করেন। বাকি বাজরা তিনি নিজের জন্য বাড়িতে নিয়ে যান।

করম পূজা : ভাদ্র মাসের আরেকটি আনন্দময় উৎসব হল করম পূজা। করম গাছের ডালকে মাটি দিয়ে ঢেকে দিয়ে পালিত হয় এই লোকপ্রিয় উৎসবটি। করম পূজার দিনে, হিন্দু শিবরাত্রির মতোই, সাঁওতাল কুমারীরা করম পূজার ফুল তোলায় জন্য বনে দীর্ঘ উপবাস করে এবং সন্ধ্যায় স্নান করে, পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে পূজার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও একটি প্রদীপ হাতে নিয়ে পূজার স্থানে যায়। পূজায় ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মধ্যে থাকে একটি হুঁটপুঁট কাঁকড়া, যেটিকে তারা পুত্রের প্রতীক বলে মনে করে। আজকাল কিছু কিছু জায়গায় এই পূজাটি একটি ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে থাকে বলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একে একটি ধর্মীয় যজ্ঞের মতো দেখতে লাগে। পরবের পরবর্তী পর্যায়ে, সাঁওতালি মেয়েরা বুড়িতে রাখা শস্য চারদিকে ছিটিয়ে পূজা করে এবং তার উপর ছোট ছোট ফোঁটায় জল ছিটিয়ে দেয়; একে জাভা উৎসব বলা হয়। পরের দিন, তারা অঙ্কুরিত চারাগাছগুলোর চারপাশে নির্দিষ্ট ছন্দে পা ফেলে প্রদক্ষিণ করে। এর পরে করম গাছের ডালগুলো পাশের পুকুর

বা নদীতে ফেলে দেওয়া হয় এবং সবশেষে অঙ্কুরিত চারাগাছগুলোর মাধ্যমে জাভা উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।^৯

জাহ্নার-সিম : এই ফসল কাটার উৎসবটি রাঢ় অঞ্চলের জাহ্নার সিম (নবান্ন) উৎসবের মতোই। আমন ধান পাকার সময় হোরো (ধান) অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। ধানের প্রথম ফল পরগণা বোঙ্গা (জেলা দেবতাদের) উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় এবং এর সঙ্গে একটি শূকরও উৎসর্গ করা হয়, যা পরে শালবনে গ্রামের লোকেরা ভক্ষণ করে। এই ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায় যে, রাঢ় অঞ্চলের বাঁকুড়া, বীরভূম এবং পুরুলিয়া জেলার সাঁওতাল গ্রামগুলিতে, ফসল সংগ্রহের আগে প্রথম ফল হিসেবে জাহ্নার বোঙ্গার নামে জাহ্নার থানে হোরো গেলে (ধানের শিষ) এবং ভুট্টা বা জোয়ার রাখা হয়।^{১০}

একইভাবে, রাঢ়ের সাঁওতালরা তাদের প্রধান ফসল কাটার আগে জাহ্নার-সিম নামে একটি উৎসব পালন করে এবং সেই উপলক্ষ্যে তাদের গোষ্ঠী দেবতা বা এলাকার দেবতার কাছে প্রায়শই মোরগ বলি দেওয়া হয়। এই উৎসবটিকে অন্যদের থেকে যা আলাদা করে তা হল, ‘কুন্দাম নায়েক’ নামে একজন বিশেষ পুরোহিত পূজার উপকরণ সরবরাহ করেন এবং বলি দেওয়া পশুর মাংস শুধুমাত্র জনজাতির পুরুষ সদস্যদের জন্যই ভক্ষণ করা অনুমোদিত। এরপর পুরোহিত নিম্নলিখিত প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে স্তব করেন—

“আমরা সৃষ্টিকর্তা পিতা পরগণাকে প্রণাম করি। আমরা জাহ্নারের নামে এই সমস্ত কিছু আপনাকে উৎসর্গ করছি; আমরা প্রার্থনা করি যে আমরা যা কিছু খাই তা যেন হজম করতে পারি। মাথা ব্যথা, ডায়রিয়ার মতো কোনো রোগ যেন না হয় এবং আমাদের মাঠের ফসল ও শস্য ভাঙারের শস্যকে আশীর্বাদ করুন। হুঁদুর এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গ থেকে সেগুলোকে রক্ষা করুন।”

দুই দিনব্যাপী রাঢ় উৎসবের প্রথম পর্বটি হল উম-নারকা (পবিত্রতার দিন)। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে অবিবাহিত সাঁওতাল ছেলেরা সারাদিনের উপবাসের পর পবিত্র উপবনে জাহ্নার এরার জন্য ছোট ছোট কুঁড়েঘরগুলো মেরামত ও পরিষ্কার করে। সন্ধ্যায় গ্রামের লোকেরা নায়েকের বাড়িতে ভিড় জমায় এবং বয়স্করা সেই অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত গানের মাধ্যমে মারান বুরু, জাহ্নার এরা, মনরেনোক, মারান মাঝি, হারাম এবং ছুদিন মাঝি হারামের কাছে সাহায্যের জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দেবতাদের উপস্থিতি অনুভব করানোর জন্য পবিত্র উপবনে একটি নৃত্যের আয়োজন করা হয় এবং এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব না হলে, দেবতাদের সংখ্যার সমান অর্থাৎ পাঁচজন ব্যক্তি রৌদ্রে শুকানো চাল দিয়ে একটি কাঁচাকলা শুকিয়ে নেন, এরপর তাঁরা একটি মাদুরে বসেন। তারপর পুরোহিত তাঁদের রৌদ্রে শুকানো চাল দেন, যা তাঁরা কুলোতে ঘষতে থাকেন। ফলশ্রুতিতে তাঁরা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এরপর পুরোহিত তাঁদের নাম জিজ্ঞাসা করেন এবং তাঁরা আচ্ছন্ন অবস্থায় একে একে পাঁচজন দেবতার নাম উল্লেখ করেন। তারপর সম্মোহনী আবেশে থাকা অভিনেতা দেবতাদের এমনভাবে আত্মহীন ও প্রশ্ন করা হয় যাতে জনজাতিদের জন্য প্রচুর ধান পাওয়া যায় এবং অত্যন্ত সংক্রামক রোগের মহামারী কার্যকর ভাবে মোকাবিলার জন্য পরামর্শ পাওয়া যায়। সবশেষে, পুরোহিত সাঁওতালদের দেবতাদের উপবন ত্যাগ করার জন্য রাজি করাতে বলেন।^{১১}

সোহরাই (কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে শীতকালীন ফসল তোলার উৎসব) : সাঁওতাল ঐতিহ্য অনুসারে সোহরাই হল দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব, যা সমস্ত ফসল ঘরে তোলার সময় প্রচুর খাদ্যশস্যের প্রাচুর্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ফসল কাটার উৎসবের পরের এক মাস ধরে সাঁওতালরা পরিমাণ না মেপেই ভাত খায়। যদিও এটি অক্টোবর-নভেম্বরের অমাবস্যা থেকে জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে যেকোনো সময় হতে পারে, তবে সাঁওতাল-অধ্যুষিত বেশিরভাগ অঞ্চলে এটি এমন এক সময়ে আয়োজন করা হয় যখন হিন্দুদের শ্যামা/ কালী পূজা আসন্ন। এর একটি কারণ হল কাজের জন্য অভিবাসী শ্রমিকদের যাত্রার আগে উৎসবে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। লক্ষণীয় গ্রামের কিছু লোক এই নির্দিষ্ট উৎসবটিকে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে নির্ধারিত আসল সোহরাই থেকে আলাদা করে দেখে। এই প্রসঙ্গে একটি আকর্ষণীয় বিষয় হল, কৃষকদের দ্বারা পালিত শ্যামা পূজার অনেক বৈশিষ্ট্য সাঁওতালদের রীতিনীতির মধ্যেও দেখা যায়, বিশেষ করে গবাদি পশুর পূজার ক্ষেত্রে। বলা যায়, সাঁওতালরা তাদের উৎসবের সময়কে প্রতিবেশীদের উৎসবের সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে নির্ধারণ করতে উৎসাহিত

বোধ করে।

আবার, সোহরাই হলো দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি সাধারণ দিন, কারণ সেই সময়ে প্রাপ্ত বাম্পার ফলন নিশ্চিতভাবে বৃষ্টি, সূর্য এবং অনুকূল আবহাওয়ার কারণেই সম্ভব হয়। উপজাতীয় বর্ষপঞ্জিতে ‘বন্ধনা’ নামেও পরিচিত এই উৎসবটি পালনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট তারিখ নেই। প্রতিটি গ্রাম এই উৎসব আয়োজনের জন্য একটি উপযুক্ত তারিখ বেছে নেয়, তবে শর্ত থাকে যে উৎসবটি অবশ্যই পৌষ মাসের শেষ পাঁচদিনের আগে শেষ হতে হবে। উৎসবটি ‘উম’ নামক একটি প্রাথমিক শুদ্ধি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয়, যখন জনজাতির সদস্যরা আনুষ্ঠানিক স্নানের মাধ্যমে নিজেদের পবিত্র করে। ঘরবাড়ি এবং উঠানও ঝকঝকে পরিষ্কার রাখা হয়। সাঁওতালি ভাষায় এটি ‘হাতি লিকা পরব’ নামে পরিচিত, যার অর্থ হাতির মতো একটি বড় উৎসব। এটি ফসল কাটার উৎসব। এই উৎসবে পরিবারের সবাইকে আসতে বলা হয়। বিবাহিত মেয়েরা এই সময়ে তাদের পিত্রালয়ে বেড়াতে আসে। উৎসব শুরু হওয়ার তিন দিন আগে সাঁওতাল মহিলারা হাঁড়িয়া তৈরির জন্য গাছের শিকড় সংগ্রহের জন্য জঙ্গলে যান। এই প্রসঙ্গে একটি গান নারী-পুরুষের সম্পর্কে চমৎকারভাবে চিত্রিত করে। উদাহরণস্বরূপ—

“ও বন্ধু, আমরা জঙ্গলের
ধানক্ষেতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।
তারা তোমাকে স্ত্রী এনে দিয়েছে,
তারা আমার জন্য স্বামী খুঁজে দিয়েছে,
ওগো আমার বন্ধু, এখন যখন আমাদের দেখা হবে,
আমরা যেন ঋ নাচিয়ে ইশারা না করি,
কিংবা মুখের দাঁত না দেখাই।”

এরপর সাঁওতালরা তাদের খাবার খায় এবং কিছুক্ষণ পরেই তারা জাহের-থানে একত্রিত হয়, যেখানে গ্রামের প্রাপ্তবয়স্কদের উপস্থিতিতে একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় খেলা অনুষ্ঠিত হয়। জনজাতির রাখালদের তাদের সামনে ডাকা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা ডিমের উপর দিয়ে তাদের গরুদের হাঁটাতে বলা হয়। যে রাখাল তার গরুকে দিয়ে ডিমটি ভাঙাতে পারে, এমনকি শুধু কাছে এসে শুঁকিয়ে দিতে পারলেও, সেখানে উপস্থিত লোকেরা উচ্চস্বরে তাকে ভাগ্যবান ছেলে বলে প্রশংসা করে। এরপর সফল গরুগুলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধুইয়ে দেওয়া হয়।

পরবর্তী বিষয়টি বিভিন্ন জনজাতীয় দেবতার জন্য খাদ্য প্রস্তুতের সঙ্গে সম্পর্কিত, যাদের মুরগি, ছাগল ও শূকরের মতো পশু বলি দিয়ে পূজা করা হয়। পূর্বপুরুষদের আত্মাদেরও পূজা করা হয় এবং তাদের স্মৃতিকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। পরিবারের প্রধানরা বাড়িতে তাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য ও পানীয় উৎসর্গ করেন। সন্ধ্যায় একটি গোষ্ঠীভোজের আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রথমে দেবতাদের উদ্দেশ্যে চালের তৈরি মদ নিবেদন করা হয় এবং তারপর জনজাতির সদস্যদের পরিবেশন করা হয়।

এই অনুষ্ঠানগুলো গো-পূজার মাধ্যমে চরমে পৌঁছায়; যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে, তখন জনজাতির যুবকরা জেগে থাকে। তারা প্রধানের বাড়ি থেকে শুরু করে বাঁশি ও ঢোল বাজাতে বাজাতে গরুদের জাগানোর জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরতে থাকে। গ্রামের যুবকরা প্রতিটি বাড়ির গোয়ালঘরের সামনে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিম্নলিখিত গানটি গায়—

“গাইনি চলিলো স্ত্রীবেন্দা বনে হো।
মহিষিনী চরে গঙ্গা পারে জয় ও রে
মহিষিনী চরে গঙ্গা পারে জো
গাইনি আওয়ায়ে আধা বেরেনা ডুবায়তে
মহিষিনী আওয়ায়ে আধা রাত জয় ও রে
মহিষিনী আওয়ায়ে আধা রাত জয়...হে।

কোন শিঙে দেবো তেল সিঁদুর।
কোন পিঠে দেবো ধুবী ধান জয় ও রে।
কোন পিঠে দেবো ধুবী ধান জো...হে।”

ডব্লিউ. জে. কালশ মনে করেন যে, নির্দিষ্ট দিনের আগের সন্ধ্যায় গ্রামের কোতোয়াল পুরোহিতের বাড়িতে দুটি সাদা এবং একটি বাদামী রঙের বলি দেওয়ার মুরগি রেখে আসেন। সেই রাতে পুরোহিত সম্পূর্ণ আত্মসংযম পালন করেন এবং খালি মেঝেতে ঘুমান। পরের দিন সকালে কোতোয়াল গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে একটি করে মুরগি, চাল, লবণ এবং তরকারি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মশলা সংগ্রহ করেন। ‘পিঠা’ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় আটা গুঁড়ো করার কাজটি পুরোহিতের স্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকে। তাঁর বোন যদি অবিবাহিত হন, তবে তিনি এই কাজটি করার অধিকারী হন। সকালে পুরোহিত গোবর দিয়ে লেপা একটি জমিতে পবিত্র বর্গক্ষেত্র এবং বৃত্ত আঁকেন। বলিদান দুপুরবেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে এগুলো পবিত্র উপবনে উৎসর্গ করা হয়, কিন্তু কিছু গ্রামে এগুলো কোনো জলধারার পাশে বা এই ধরনের অনেক হ্রদের তীরে রেখে দেওয়া হয়। পুষ্প উৎসবের গণনার মতোই পবিত্র স্থানটি উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রথমে বেড়াগুলোর উপর চাল ছিটানো হয় এবং চালের উপর কিছুটা সিঁদুর দেওয়া হয়। তারপর মন্ত্রপাঠ করে সেগুলোর উপর জল ছিটানো হয় এবং তারপর মাথা, কজি ও পায়ে সিঁদুর মাখানো হয়। বলিদান শেষ হলে পুরোহিত মাথাগুলোর মাংস ভক্ষণ করেন, আর গ্রামবাসীরা প্রতিশ্রুত মাংস ও সবজির ছোট ছোট টুকরোর সুস্বাদু খাবার পেট ভরে খায় এবং সবশেষে মদ্যপান ও গানে মেতে ওঠে।^{১২}

পরের দিনের অনুষ্ঠানটি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। চার বা পাঁচ দিনব্যাপী এই উৎসব চলাকালীন, গ্রামের যুবকেরা গ্রামের কোতোয়ালকে তার বাড়িতে আটকে রাখে এই শর্তে যে, যতক্ষণ না সে তাদের মদ্যপান করিয়ে আপ্যায়ন করতে রাজি হবে, ততক্ষণ তাকে মুক্তি দেওয়া হবে না। উৎসবের এই দিনে, এই গোষ্ঠীগুলো তাদের পূর্ববর্তী আত্মাদের উদ্দেশ্যে বলিদান করে।^{১৩} বলিদানের পূর্ববর্তী পর্যায়ে, সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলো আনুষ্ঠানিক স্নান করে এবং মহিলারা ধনুক ও তীর, কুড়াল ও বর্ষার মতো শিকারের সরঞ্জামগুলো জলাশয়ে নিয়ে যায়।

এল.এস.এস. ও’ম্যালির বিবৃতি অনুসারে, সাঁওতাল গ্রামগুলো সারা বছর ধরে কৃষি কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন উৎসবের সাক্ষী থাকে। এর মধ্যে প্রধান হল সোহরাই বা ফসল কাটার উৎসব, যা পৌষ মাসের শেষ পাঁচ দিনে (জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে) অনুষ্ঠিত হয়, বছরের ধান ফসল ঘরে তোলার পর। একটি তারিখ ঠিক করা হলে, প্রতিটি বাড়িতে মদ (হাঁড়ি) তৈরির প্রস্তুতি চলে এবং প্রতিটি পরিবারের প্রধানরা আত্মীয়স্বজন, বিশেষ করে মেয়ে, বোন এবং অন্যদের আমন্ত্রণ জানান। উৎসব শুরু হওয়ার আগের রাতে, নায়ক কঠোরভাবে সংযমী জীবনযাপন করেন এবং মেঝেতে মাদুরের উপর ঘুমান। পরের দিন, গোডেত ঘুরে ঘুরে প্রতিটি বাড়ি থেকে বলিদানের জন্য মুরগি সংগ্রহ করে। মধ্য-সকালে, নায়ক গ্রামের কিছু লোকের সঙ্গে জলের কাছাকাছি কোথাও যান, গোডেত মুরগিগুলো সঙ্গে নিয়ে যায়। স্নান করার পর নায়ক বিভিন্ন বোঙাদের উদ্দেশ্যে মুরগিগুলো বলি দেন, যার পরে গ্রামের উত্তরাধিকারী মুরগিগুলো আগুনে পুড়িয়ে খাবার তৈরি করে এবং সেগুলো খেয়ে হাঁড়ি পান করতে আসক্ত হয়। এরপর মাঝি নিষিদ্ধ ফল স্পর্শ করার পরিণাম সম্পর্কে গ্রামবাসীদের সতর্ক করেন। মাঝিদের এই ধরনের আহ্বান খুব কমই ব্যর্থ হয়।^{১৪}

চতুর্থ দিনটিকে ‘হাকো কাট কম’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার অর্থ মাছ ধরা এবং কাঁকড়া ধরার দিন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, সাঁওতালরা এই দিনে শিকারে যেতে বাধ্য এবং যদি তারা অন্য কিছু খুঁজে না পায়, তবে তাদের মাছ বা কাঁকড়া মারতে হবে।

এখন থেকে আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয় এবং ‘জালে’ নামক একটি বিশেষ দিনে, জনজাতির সদস্যরা শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য বাড়ি বাড়ি যান।

পঞ্চম দিনে আসে ‘সাকরাত’, যা পৌষ মাসের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয়। মাছ ধরার দিনের আগের দিন এবং সাকরাতের দিনেই পুরুষরা শিকারে বের হয়, যখন পিঠে চাল এবং পিঠা তৈরি করা হয়। মহিলাদের দ্বারা সংগৃহীত জিনিসপত্রগুলো পরে পুরুষদের মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। বিকেলে, জোগমাঝি পুরুষদের একত্রিত

করা হয়, তারা সবাই মিলে একটি লক্ষ্যবস্তুতে তীর ছোড়ে। এর পরে তারা যুদ্ধনৃত্য করে এবং বিভিন্ন ধরনের আমোদ-প্রমোদে মেতে ওঠে।

সাঁওতালদের মনে পাঁচ দিনব্যাপী এই উৎসবের সম্মিলিত প্রভাব ছিল অসাধারণ। উপরোক্ত উৎসবে সরাসরি অংশগ্রহণের কারণে তারা অত্যন্ত সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এছাড়াও, উৎসবে সাঁওতালদের জন্য পেট ভরে খাওয়া, মদ ও মদ্যপানে মত্ত হয়ে আমোদ-প্রমোদ করা এবং ফলস্বরূপ আনন্দ-উল্লাস করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, যা উৎসব শেষে বাড়ি ফেরার পথে তারা হাসিখুশি মনে স্মরণ করত এবং এই সময়টি এতটাই আনন্দের ছিল যে তা স্বর্গের দেবতাদেরও হিংসা ও বিদ্বেষের কারণ বলে মনে হত।^{১৫}

বন্ধনা পরবের গানগুলো শুধু মানভূম-পুরুলিয়ারই নয়, বরং বৃহত্তর আদিবাসী ঝাড়খণ্ডের কৃষিজীবী মানুষের কাছেও সুপরিচিত। এই গানটি এই বৃহৎ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মানুষের কাছে বন্ধনা পরবের আগমন বার্তা ঘোষণা করে। বন্ধনা পরব হল সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে কৃষিজীবী মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধির একটি অনুষ্ঠান। তবে, যে লক্ষ্মীর কাছে বিনীত প্রার্থনা করা হয়, তিনি পৌরাণিক দেবী লক্ষ্মী নন, বরং তিনি হলেন জনপ্রিয় সমাজের ধন-সম্পদস্বরূপা লক্ষ্মী, যিনি দিনি ঠাকুরানী নামে পরিচিত এবং ভগবতী হলেন আমাদের ঘরোয়া ঠাকুর, যিনি গরু ও বাছুরের সর্বশক্তিমান রক্ষাকর্তা। বন্ধনা পরবের সঙ্গে গাওয়া গানটি এই অঞ্চলে আহির গীত নামে পরিচিত। এই গান থেকে সাধারণ মানুষের জীবনের একটি ঝলক পাওয়া যায়।^{১৬}

Reference:

১. রয়, উইলিস, (সম্পাদক), ওয়াইল্ড মিথোলজি, পার্কাস, লন্ডন, ১৯৯৭, পৃ. ১২-১৩
২. জন মোনাঘান এবং পিটার জাস্ট, আ শর্ট হিস্টরি অফ সোশ্যাল এবং কালচারাল এনথ্রোপোলজি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০, পৃ. ৩৫
৩. মুর্মু, বোরো, রাঢ় অঞ্চলে সন্তালদের ধর্ম এবং উৎসব, অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, বিশ্বভারতী, ২০০৯-২০১৪
৪. তুড়ু, রেকা রামদাস, খেরোয়ার বোগশো ধুরাম পুথি: সন্তাল ধর্ম ও সংস্কৃতির আদি গ্রন্থ, সুকুমার শিকদার এবং সারদা প্রসাদ কিস্কু সম্পাদিত, নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭, পৃ. ৩৬
৫. পাণ্ডা, বিজয়, আদিবাসীদের দেবী জাহের এরা প্রসঙ্গে, ছত্রাক প্রকাশনী, ১৯৯৭
৬. সেন, শুচিত্রত, সাতোরের সন্ধানে বঙ্গসংস্কৃতি: আদিবাসীয়াপন ও অন্যান্য, পৃ. ১৬৭
৭. মুর্মু, বোরো, তদেব
৮. মুর্মু, বোরো, তদেব
৯. মুর্মু, বোরো, তদেব
১০. জে. ত্রোইসি (১৯৪৯), হিন্দু-ট্রাইবাল রিলিজিয়াস ইন্টারঅ্যাকশন কালচার অ্যান্ড ইভাঞ্জেলাইজেশন, পৃ. ৯১-১২৩
১১. বোরো মুর্মু, তদেব
১২. ঘোষ, সুনন্দা, আধুনিকতা ও সাঁওতাল সংস্কৃত পরিবর্তন, অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, বিশ্বভারতী, ২০১৭, পৃ. ৫৬
১৩. ঘোষ, সুনন্দা, তদেব, পৃ. ৫৮
১৪. মুর্মু, বোরো, তদেব
১৫. মণ্ডল, হিমাংশু, উপনিবেশিক ও স্বাধীনতা উত্তর যুগের বীরভূমের সাঁওতাল জীবনের অবস্থা, অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৫৭
১৬. মুর্মু, বোরো, তদেব